

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস যা বলে

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল মাওয়া

রোলঃ ২১৫০০০২৪

৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস যা বলে

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল মাওয়া

রোলঃ ২১৫০০০২৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “কোরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস যা বলে” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল মাওয়া, আইডিঃ ২১৫০০০২৪ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওলানা মামুনুর রশিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নামঃ

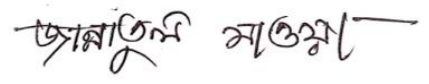
ডিপার্টমেন্টঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “কোরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস যা বলে” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মামুনুর রশিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

জাম্নাতুল মাওয়া

আইডিঃ ২১৫০০০২৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৫
সারসংক্ষেপ	৬
আল-কুরআনের সংকলন ও সংরক্ষণের গুরুত্ব	৭
আল কুরআনের পরিচয়	৯
ওহির আসল পরিচয়	১৩
মানব জাতির কল্যাণে আল কুরআনের ভূমিকা	১৫
আল-কুরআন হিদায়াতের একমাত্র কিতাব	১৫
আল-কুরআনের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে	১৭
আল-কুরআনের আমলকারীর মর্যাদা	১৮
আল-কুরআন শিক্ষার পথ হচ্ছে জান্নাতের পথ	১৯
কুরআন বিহীন শরীর বিরান বাড়ীর মত	২০
আল-কুরআনের কথা সঠিক কথা	২০
কুরআন অধ্যয়নকারীকে আল্লাহ স্বরণ করেন	২১
আল-কুরআনের সম্মোহনি শক্তি	২২
আল-কুরআন অমান্যকারীর পরিণতি	২৫
শেষ জামানায় কুরআনের আমল থাকবে না	২৬
পবিত্র কোরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস	২৮
কুরআন সংকলনের পর্যায়সমূহ	২৮
প্রথম পর্যায়	২৮
দ্বিতীয় পর্যায়	৩০
তৃতীয় পর্যায়	৩৪
বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৪৩
পবিত্র কুরআনের ভাষান্তর সূচনা	৪৩
বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের পরোক্ষ অনুবাদের ধারা	৪৪
বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের প্রত্যক্ষ বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর	৪৫
বাংলা সাময়িকপত্রে কুরআন চর্চা	৪৮
পরিসমাপ্তি	৪৯

ভূমিকা

মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এসকল নবী-রাসূলদেরকে গাইডবুক হিসেবে সহীফা ও কিতাব দিয়েছেন। এসব কিতাব সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে আল-কোরআন। পূর্ব পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপরে ঈমান আনা এবং আল-কোরআনকে মেনে চলা মুসলিমদের উপরে আল্লাহ তায়ালা ফরজ করেছেন। আল-কোরআন এসেছে বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াতের সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘রমযান মাস, যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।’

(সূরা আল-বাকারা-১৮৫)

আল-কুরআনের প্রথম বাণী হচ্ছে, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ “পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা আলাক-১) এখানে ইকরা, অর্থ: পড়ো। এ আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলিমকে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন তোমরা জানার জন্য, বোঝার জন্য এবং সঠিকটা মেনে চলার জন্য পড়া-লেখা করো, অধ্যয়ন করো। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালা ফরজ করে দিয়েছেন। আর এটার বাস্তব নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল (সা.)। আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ।” (সুনান ইবনে মাজা)

জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আল-কুরআন শিক্ষা করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপরে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ

“হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা কুরআন ও ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন) শিক্ষা করো এবং মানুষদেরকে শিক্ষা দাও কেননা আমাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে।” (সুনান আত-তিরমিযি)

তাই আমাদের উপরে কর্তব্য আল-কুরআন ও ইলমে ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন) শিক্ষা করা এবং এর আলোকে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র পরিচালনা করা।

সারসংক্ষেপ

আল কুরআন মহান আল্লাহ তাআলা প্রেরিত মানব জাতির জন্য হিদায়াত স্বরূপ। এই মহাগ্রন্থ সংরক্ষণ মানব জাতির জন্য অপরিহার্য। এই মহাগ্রন্থ সংরক্ষণের পেছনে রয়েছে ইতিহাস। পবিত্র কুরআনের সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস বলতে নবী হযরত [মুহাম্মদ](#) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ধারাবাহিকভাবে নাযিলকৃত আয়াত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করাকে বোঝানো হয়। এটি কয়েক যুগ যাবত ব্যাপ্ত ছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উক্ত রিসার্চ পেপারের মূল আলোচ্য বিষয় এটি।

মুসলমানদের বিশ্বাস ও ইসলামি গবেষকদের তথ্য মতে, কুরআন নাযিল ৬১০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়, যখন ফেরেশতা [জিবরাইল](#) (Arabic: جبريل, *Jibrīl* or جبرائيل, *Jibrā'īl*) [মক্কা](#) নগরীর [হেরা](#) পর্বতে, সর্ব প্রথম কোরআনের [সূরা আলাক](#) এর প্রথম পাঁচটি [আয়াত](#) নবী মুহাম্মাদ ﷺ কে পাঠ করান। আর এই ধারাবাহিকতা ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ইন্তেকালের মাধ্যমে শেষ হয়।^[১] আমরা আজ যে কোরআন গ্রন্থাকারে দেখতে পাই, সেটি সংকলন করেছেন ইসলামের তৃতীয় [খলিফা](#) [উসমান](#) রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু(৬৪৪ থেকে ৬৫৬)। তিনি আমিরুল মু'মিনিন বা বিশ্বাসীদের নেতা হিসাবে তার [খিলাফতের](#) (ইসলামিক সরকারের) সময় হুযায়ফা ইবনে ইয়েমেনি (রা:) এর পরামর্শে এ দায়িত্ব পালন করেন। যার জন্য তাকে আজও [জামিউল কুরআন](#) বা কুরআন

সংকলনকারি বলা হয়। আর পুরো বিশ্বে তার সময়ে লিপিবদ্ধ করা কুরআন প্রচলিত রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8#:~:text=%E0%A6%89%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%20%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%87%20%E0%A6%86%E0%A6%AB%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A8%20%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%20%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0,%E0%A6%93%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%20%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A5%A4

আল-কুরআনের সংকলন ও সংরক্ষণের গুরুত্ব

আল-কুরআনের সংকলন ও সংরক্ষণের গুরুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন ইসলামের পবিত্র বই এবং মুসলিমদের জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এটি মুসলিমদের ধর্মীয় জীবনের নির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতির উপর ভিত্তি করে তাদের শিক্ষা দেয়। কুরআনের সংকলন ও সংরক্ষণ একটি দীর্ঘ এবং যত্নশীল প্রক্রিয়া ছিল। তা হয়তো একটি মুখ্য কারণ ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো আলোচনা বা বিবাদ উৎপন্ন করা না।

এই গুরুত্বের মধ্যে কিছু বিশেষ বিষয় রয়েছে:

১. ধর্মীয় গুরুত্ব: কুরআন মুসলিমদের জীবনের নির্দিষ্ট নীতি ও নিয়ম প্রদান করে। এটি ইসলামিক শরীয়ার প্রধান উৎস এবং গাইডলাইন।

২. ঐতিহাসিক মূল্য: কুরআন ইসলামের উদয় এবং বিকাশের একটি মূল উৎস এবং মুসলিম সমাজের ঐতিহাসিক উদ্যোগের উৎস।

৩. ভাষায় গুরুত্ব: কুরআনের ভাষা সমৃদ্ধ, গভীর, ও সুন্দর। এটি আরবি ভাষার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নমুনা এবং সমৃদ্ধ উপাদান। এর সঠিক উচ্চারণ এবং গভীর অর্থ সঠিকভাবে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন।

৪. অনুষ্ঠানিক গুরুত্ব: কুরআন মুসলিম অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় বই। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ইবাদাত এবং শারীরিক পরিকল্পনা এবং সামাজিক নীতি এবং নীতিনির্ধারণে এর অসামান্য গুরুত্ব রয়েছে।

এই গুরুত্ব মহত্ব থেকেই কুরআনের সংরক্ষণ, সংকলন এবং অনুষ্ঠান এর সময় সতর্কতা এবং যত্নের সাথে অধিকার করা হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে অসংখ্য মুসলিম জাতির বাস্তবায়নে একটি অন্যতম মূল দলিল। আল-কুরআন একটি অত্যন্ত পবিত্র বই, যা ইসলামের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই বইটি মুসলিমদের জীবনের নির্দিষ্ট নীতি ও নিয়মের উপর ভিত্তি করে। কুরআনের বিষয়ে বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষতা রয়েছে যে, ইসলামী ধর্মে এর প্রত্যেকটি শব্দ সম্পূর্ণ একইভাবে প্রয়োগ করা হয়, এবং এর ওপর সার্বিক সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রয়োজন।

কুরআনের সংকলন এবং সংরক্ষণ তার মূল্য ও প্রভাব বজায় রেখেছে দ্বিতীয় ইসলামী শতাব্দীর আগের কাল থেকে। এটি মুসলিম সমাজের জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুরআনের ওপর শ্রদ্ধার সম্ভাবনা ও সম্মান তার প্রচার এবং সংরক্ষণের সঠিক উদাহরণ প্রদর্শন করে।

কুরআনের সংকলন এবং সংরক্ষণের ইতিহাস মূলত একটি শ্রদ্ধার বিষয় এবং এটি ইসলামী সম্প্রদায়ের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি সংকলনের ক্ষেত্রে প্রাচীন ইসলামী সাহাবাদের যুগের মধ্যে ঘটে এবং সামান্য পরিবর্তন ও সংশোধনীয়

কাজ ছিল। সংরক্ষণের জন্য মুসলিম সাহাবাদ এবং তারা পরবর্তী প্রজন্মের মাধ্যমে কাজ করেছিল।

এই সংরক্ষণ ও সংকলনের গুরুত্ব মহান সেবার একটি অংশ এবং কুরআন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধার্মিক এবং ঐতিহাসিক সম্পদ। এর মূল গুরুত্ব এবং প্রভাব ইসলামী সভ্যতা এবং মানবিক সম্প্রদায়ে অবিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে।

আল কুরআনের পরিচয়

আল কুরআন মহান স্রষ্টার নাজিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব। মহান স্রষ্টা বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পর তিনি তা পরিচালনা, প্রতিপালন ও সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি বা বিধান তৈরি করে দিয়েছেন। প্রত্যেক সৃষ্টিই সে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি বা বিধান অনুসরণ করে চলছে। তাই সমগ্র সৃষ্টিজগতে যেমন কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, তেমনি আল্লাহর নিয়মনীতির মধ্যেও কোনো ব্যতিক্রম বা ব্যত্যয় নেই। অনুরূপভাবে, মানুষ সৃষ্টির পরও তিনি মানবজাতির সুষ্ঠু, সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য একটি বিধান দিয়েছেন, এ বিধানের নাম ইসলাম।

মানুষ সৃষ্টির সময় থেকেই মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এ বিধান কার্যকর রয়েছে। আদি মানব আদম আ: থেকে এ বিধান চালু হয়েছে। আদম আ:কে সৃষ্টির পর জান্নাতে তাঁকে কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে, তা স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে শিখিয়েছেন। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির পর তিনি স্বয়ং তাঁকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন, ভাষার মাধ্যমে তাঁকে নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বারা মানুষ যেমন ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি বুঝতে পারে, তেমনি ভাষার দ্বারা সে নিজেকে সম্যকরূপে অন্যের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম। ভাষা ও জ্ঞান শিক্ষার প্রধান মাধ্যম কলম। মহান স্রষ্টা সে কলমের কথাও তাঁর আসমানি কিতাবের শুরুতেই উল্লেখ করেছেন।

আদম আ: ও মা হাওয়া আ: যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন স্বয়ং আল্লাহ তাঁদের পৃথিবীতে সঠিক পথে চলার পথ-নির্দেশনা দেন। এ নির্দেশনাকে আল কুরআনের ভাষায় বলা হয় ‘ওহি’। এ ওহির নির্দেশনায় যুগে যুগে আল্লাহর মনোনীত খাস বান্দারা মানবজাতিকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। এ খাস বান্দাদের কুরআনের ভাষায় নবী ও রাসূল বলা হয়। প্রথম মানব আদম আ: ছিলেন প্রথম নবী। পরবর্তীতে প্রায় এক লাখ চব্বিশ হাজার বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদূর রাসূলুল্লাহ সা:। প্রত্যেক নবী-রাসূলের ওপর আল্লাহ তায়ালার ওহি নাজিল হয়েছে। কারো কারো ওপর আসমানি কিতাব ও সহিফা নাজিল হয়েছে। সহিফা হলো ক্ষুদ্রায়তন উপদেশ বাণী। কিতাব হলো বড় আকারের পূর্ণায়তন হিদায়াত গ্রন্থ। সর্বমোট চারটি কিতাব নাজিল হয়েছে। এগুলো হলো তাওরাত, জাবুর, ইঞ্জিল ও আল কুরআন। প্রথম তিনটি কিতাব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিকৃত-বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন, যা আখেরি নবীর ওপর নাজিল হয়েছে, তা কিয়ামত পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে হেফাজত করার দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। তাই নাজিল হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এ কিতাবের একটি বর্ণ বা জের-জবরও মুছে যায়নি বা বিকৃত হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত এ মহান কিতাব সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকবে এবং সমগ্র মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলো, মিথ্যা থেকে সত্য, অন্যায় থেকে ন্যায়, অমানবিকতা থেকে মানবিকতার উজ্জ্বল পথের সন্ধান দেবে। তাই সত্য, সুন্দর, ন্যায়, শান্তি, কল্যাণ ও মানবিকতার পথে উত্তরণের জন্য আল কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য সঠিক পথের নির্দেশনা রয়েছে।

মানবজীবনে সাফল্য অর্জন এবং পৃথিবীতে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনে আল কুরআনের কোনো বিকল্প নেই। আল কুরআন শুধু মুসলিম নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত একমাত্র সঠিক-নির্ভুল হিদায়াত গ্রন্থ। তবে এ গ্রন্থের ওপর যারা ঈমান আনে এবং অনুসরণ করে, তাদের বলা হয় মুসলিম। মুসলিম অর্থ অনুগত। আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে যারা আল্লাহর নির্দেশ বা দ্বীনের আনুগত্য করে তারাই মুসলিম।

আল কুরআন মহান স্রষ্টার পবিত্র বাণী। তাই অন্য কোনো কিছুর সাথে এর তুলনা করা চলে না। এরূপ কোনো গ্রন্থ তো দূরের কথা, এ গ্রন্থের একটি ক্ষুদ্র বাক্যাংশের অনুরূপ কোনো কিছু রচনা করাও কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ অসাধারণ মহিমাম্বিত গ্রন্থটি নাজিল হয়েছে, তাই অন্য কোনো গ্রন্থের সাথে এ গ্রন্থের তুলনা করা কোনো মতেই সম্ভব নয়।

আল কুরআনের ভাব-ভাষা-বর্ণনা অসাধারণ। আল কুরআনে নেই, এমন কোনো বিষয় পৃথিবীতে নেই। এটি যেমন মাধুর্যময়, কাব্যময়, রূপক-অলঙ্কার-উপমাসমৃদ্ধ, তেমনি এ গ্রন্থ অতিশয় জ্ঞানগর্ভ, প্রজ্ঞা, শিক্ষা ও উপদেশ লাভের জন্য অতুলনীয়। এর ভাষা ও বর্ণনা এত মনোমুগ্ধকর যে, এ গ্রন্থ তিলাওয়াতে অপরিসীম আনন্দ লাভ হয়। এ কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মুসলিম এ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করেছেন। পৃথিবীতে দ্বিতীয় এমন কোনো গ্রন্থ নেই, যার আবৃত্তি এত মনোমুগ্ধকর ও যা সহজে মানুষ মুগ্ধ করতে পারে। আল কুরআনের এটা এক অলৌকিক বৈশিষ্ট্য।

এ মহান গ্রন্থ যেহেতু স্বয়ং স্রষ্টার বাণী, তাই এ পবিত্র বাণী পাঠ ও শ্রবণেও অসীম ছওয়াব নিহিত। কিন্তু শুধু পাঠের জন্য এ কিতাব নাজিল হয়নি। এটি হলো মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য হিদায়াত বা পৃথিবীতে সঠিক পথে চলার নির্দেশনা। মানুষ এ কুরআন পাঠ ও কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলে মানবজীবনে সফলতা আসবে। অন্যথায়, তার জীবন বিফল হবে, সন্দেহ নেই। কুরআন অনুসরণকারীর জীবন দুনিয়াতেও সফল, আখিরাতেও সে অফুরন্ত নেয়ামত লাভে সক্ষম। অতএব, যে মানুষ নিজের ভালো, কল্যাণ, শান্তি ও সাফল্য চায়, তার অবশ্যই কুরআন পাঠ ও তার নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায়, তার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কেননা, মানবজীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্যই স্রষ্টার পক্ষ থেকে এ বিধান নাজিল হয়েছে।

আল কুরআন শুধু ব্যক্তি মানুষকে সঠিক পথ-নির্দেশনা দেয় না, সমষ্টি তথা সমাজ, রাষ্ট্র তথা সমগ্র বিশ্বকে সঠিক পথ-নির্দেশনা দেয়। মানুষ ও জগতের সাথে যা কিছু সম্পর্কিত, সে সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহ আল কুরআনে সঠিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

ব্যক্তি, সমষ্টি, সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে আল কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, ব্যবসাবাণিজ্য, কায়কারবার, মানুষের আচার-আচরণ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, আনন্দ-বিনোদন ইত্যাদি সব বিষয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নাজিলকৃত পবিত্র গ্রন্থে সুস্পষ্ট নীতিমালা দেয়া হয়েছে। এ জন্য ইসলাম প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের মতো নয়, এটা মানবজীবনের সামগ্রিক বিধান, যা স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত। অতএব, এটা একটি সম্পূর্ণ, সার্বজনীন, সর্বকালীন, চিরন্তন, শাস্ত, নির্ভুল বিধান। এ বিধান শুধু মুসলিম নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য। তাই এ সম্পর্কে জানা, এর চর্চা ও অনুসরণ করা, প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য।

আল কুরআন নিছক ধর্মতত্ত্ববিষয়ক কোনো গ্রন্থ নয়। এতে একাধারে রয়েছে ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন, নীতিকথা, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মানুষ ও জগৎ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়, সৃষ্টিজগৎ, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক, ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়। আল কুরআনে স্বয়ং স্রষ্টা ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যা এ গ্রন্থে নেই। এ থেকে বুঝা যায়, এ এক মহা অলৌকিক গ্রন্থ। এ ধরনের কোনো গ্রন্থ মানুষের পক্ষে রচনা করা শুধু অসম্ভব নয়, অকল্পনীয়ও বটে। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, আল কুরআন মহান স্রষ্টার নাজিলকৃত গ্রন্থ। সমগ্র মানবজাতির সঠিক পথ-নির্দেশনা রয়েছে এ মহাগ্রন্থে।

আল কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে। পৃথিবীতে ভিন্ন ভাষাভাষী অন্যরা যাতে আল কুরআনের অর্থ, তাৎপর্য ও মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারে, সে জন্য পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই আল কুরআনের অনুবাদ হয়েছে। আল কুরআন একমাত্র গ্রন্থ, যা পৃথিবীতে প্রচলিত সর্বাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও বিভিন্ন বিজ্ঞ আলেম বিভিন্ন সময় আল কুরআনের সহজ-সুন্দর অনুবাদ করেছেন। তাই বাংলাভাষীদেরও আল কুরআনের মর্মবাণী জানা ও সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা অনেকটাই সহজসাধ্য। তবে আল কুরআন মহান আল্লাহর এমন এক অলৌকিক গ্রন্থ যে, এ গ্রন্থের সম্পূর্ণ সঠিক অনুবাদ করা যেকোনো ভাষায় অত্যন্ত কঠিন। তবে এর

মর্মবাণী যথাসম্ভব অনুবাদের মাধ্যমে সবাই উপলব্ধি করতে সক্ষম। আর বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে মোটামুটি সঠিক ধারণা লাভ করা অনেকটাই সম্ভব।

আল কুরআনের সঠিক অর্থ বুঝার জন্য আরবি ভাষায় গভীর জ্ঞান থাকা অত্যাৱশ্যক। দুর্ভাগ্যবশত, সবার সে জ্ঞান নেই। ভিন্নভাষীরা ও আরবি ভাষায় অদক্ষ ব্যক্তিরা অনুবাদ পড়ে এ মহান গ্রন্থের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারেন। তাই প্রত্যেকের আরবি শিখে শুদ্ধরূপে কুরআন পড়ার চেষ্টা করার সাথে সাথে তার মাতৃভাষায় কুরআনের অনুবাদ পড়ে এর মর্মার্থ উপলব্ধি করা এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করা উচিত। মহান স্রষ্টা তাঁর সব বান্দাকে তাঁর পবিত্র হিদায়াত গ্রন্থ অধ্যয়ন, অনুধাবন ও সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তৌফিক এনায়েত করুন।

তথ্যসূত্র

https://www.dailynayadiganta.com/islami-diganta/437856/%E0%A6%86%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%9F#google_vignette

ওহির আসল পরিচয়

ওহির অভিধানগত মূল অর্থ হলো গোপনে জানানো। আল হাররালি নিকট আভিধানিক অর্থে ওহি হলো গোপনীয়ভাবে অন্তরে অর্থ প্রক্ষেপণ। আযহারি বলেছেন, ইশারা ইঙ্গিতকেও ওহি বলে। অনুরূপভাবে লেখাকেও ওহি বলা হয়। রাগেব আল ইসফাহানি বলেন, ওহির মূল অর্থ হলো দ্রুত ইশারা করা। আর যেহেতু ওহি দ্রুততার অর্থবহ এ জন্যেই বলা হয়েছে যে ওহিজাত নির্দেশ। অর্থাৎ যে কথা ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

এ জন্যেই ওহির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, অর্থাৎ গোপনীয়তা ও দ্রুততাসহ কাউকে কিছু জানানো, যা কেবল উদ্দিষ্ট ব্যক্তিই জানতে পারে এবং অন্যদের থেকে গোপন থাকে।

আভিধানিক অর্থে ওহির প্রকার: ১. মানুষের প্রতি প্রাকৃতিক ইলহাম, অর্থাৎ কারো অন্তরে বিশেষ অনুভূতি প্রক্ষেপণ করা। যেমনটি ছিল মূসা আলাইহিস সালামের মায়ের ক্ষেত্রে। ইরশাদ হয়েছে, আর আমি মূসার মায়ের প্রতি ওহি (নির্দেশ) পাঠালাম। (সূরা আল কাসাস : ৭) ২. জীবজন্তুর স্বভাব-সংক্রান্ত ইলহাম, যেমন মৌমাছির প্রতি ইলহাম। ইরশাদ হয়েছে, আর তোমার রব মৌমাছিকে ইঙ্গিতে জানিয়েছেন যে, তুমি পাহাড়ে ও গাছে এবং তারা যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে নিবাস বানাও (সূরা আন-নাহল : ৬৮) ৩. জড়পদার্থের প্রতি আল্লাহ তাআলার মহবৈশ্বয়িক নির্দেশ। ইরশাদ হয়েছে, যখন প্রচ-কম্পনে যমীন প্রকম্পিত হবে। আর যমীন তার বোঝা বের করে দেবে। আর মানুষ বলবে, এর কী হল? সেদিন যমীন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, যেহেতু তোমার রব তাকে নির্দেশ দিয়েছেন (সূরা আয-যিলযাল : ১-৫) ৪. কোনো অঙ্গ দ্বারা ইঙ্গিতসূচক দ্রুত ইশারা, যেমন যাকারিয়া আলাইহিস সালামের ইশারা। ইরশাদ হয়েছে, অতঃপর সে মিহরাব হতে বেরিয়ে তার লোকদের সামনে আসল এবং ইশারায় তাদের বলল যে, তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করো। (সূরা মারয়াম : ১১) পারিভাষিক অর্থ : আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীদের নিকট শরীয়ত অথবা কিতবের যা পৌঁছাতে চান তা তাদের পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেয়া।

তথ্যসূত্র

<https://www.amadershomoy.com/bn/2017/12/08/395219.htm>

ওহী কিসের মধ্যে লিখা হতঃ

যখন আল-কুরআন নাযিল হয় তখনকার যুগে লেখার উপকরন ছিল খুবই দুর্লভ। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত না হওয়ায় সাহাবীগণ নাযিলকৃত কুরআনের আয়াত খেজুরের ডাল, প্রস্তর খন্ড, চামড়া-উটের চামড়া, হাড়, কাপড়ের টুকরা, গাছের পাতা, বাকল, বাঁশের টুকরা,

পশুর হাড়, পাথর-শিলা প্রভৃতি বস্তুর উপর লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেন। তাদেরকে কাতিবে ওহী বলা হত। নবী (ﷺ)-এর দরবারে মোট ৪২ জন কাতিবে অহী ছিলেন।

ওহী লেখক কারা ছিলেনঃ

রাসুল (ﷺ)-এর নিকট যখন কোন ওহী আসত তখন একদল সাহাবী ওহীগুলো বিভিন্ন জিনিসের উপর লিখে রাখতেন, এদেরকে কাতিবে ওহী বলা হত। প্রায় ৪২ জন সাহাবী ওহী লিখেছেন। রাসুল (ﷺ)-এর নিকট হযরত জিব্রাইল (عليه السلام) কুরআনের যে অংশ যখন নিয়ে আসতেন, তা কোন সুরার কোন স্থানে সংযোগ করতে হবে তা তিনি বলে দিতেন। আর রাসুল (ﷺ) তখন ওহী লিখক সাহাবীদের ডেকে অবতীর্ণ অংশকে সংশ্লিষ্ট সুরার নির্ধারিত স্থানে সংযোগ করার নির্দেশ দিতেন। কাতিবে ওহীদের অন্যতম হলেন হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (رضى الله عنه)। হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী (رضى الله عنه), উবাই ইবন কা'ব, আয যুবাইর ইবনুল আওয়াম, হযরত মু'আবিয়া, আব্বাস ইবনুল সা'ঈদ, আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, ইবন মাসউদ, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, মুগীরা ইবন শু'বা ও হানযালা (رضى الله عنه) এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মানব জাতির কল্যাণে আল কুরআনের ভূমিকা

আল কুরআনের প্রয়োজনীয়তা মানব জীবনে অনস্বীকার্য। নিম্নে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো:

আল-কুরআন হিদায়াতের একমাত্র কিতাব

আল-কুরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবাতার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব। এই কুরআনই বিশ্বের সকল মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে, হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
كَبِيرًا (৯) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“নিশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।” (সূরা বনি ইসরাইল- ৯-১০)

فَإِذَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (১৫) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন।” (সূরা আল-মায়দা- ১৫-১৬)

আল-কুরআন ছাড়া অন্য কারো কাছে হিদায়াত অন্বেষণ করা যাবে না। কেউ এটা করলে আল্লাহ নিজে তাকে গুমরাহ করে দিবেন। এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ

“যে ব্যক্তি কুরআন ছাড়া অন্য কারো কাছে হিদায়াত চাইবে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দিবেন।” (সূনান আত-তিরমিযি)

অতএব, আমাদের জীবন চলার পাথ ইসলামকে সঠিকভাবে জানার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব আল-কুরআন শিক্ষা করতে হবে।

আল-কুরআনের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে

বিশ্ব মানবতার জীবন পরিচালনার জন্য যা দরকার আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের মধ্যে সব দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্য এমন কিছু নাই যার প্রয়োজন আছে অথচ কুরআনে তা বলা হয়নি, বরং সব কিছুকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিস্কার করে আল-কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।” (সূরা আন-নাহল- ৮৯)

এ কিতাব থেকে যদি কেউ তার জীবনের চলার গাইড হেসেবে সম্পূর্ণটা মেনে চলে তাহলে সে সকল ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করবে। আর যদি কিছু মানে কিছু অস্বীকার করে তাহলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفْتَوْمُنُونِ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ

“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।” (সূরা আল-বাকারা- ৮৫)

তাই আমাদের উচিত আল-কুরআন শিক্ষা করা, কুরআনের সকল বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আল-কুরআন মেনে চলা, তাহলেই দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে মুক্তি পাওয়া যাবে।

আল-কুরআনের আমলকারীর মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.) এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত সকল বাতিল দ্বীনের উপরে দ্বীন ইসলামকে বিজয় করার জন্য। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।”

(সূরা আস-সফ-৯)

আল-কুরআন বিশ্ব মানব সভ্যতার দরবারে সবচেয়ে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ কিতাব। এ কিতাবের আমলকারীকে এবং কিতাবের বিধান প্রতিষ্ঠাকারীকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং পরিবারের লোকদের জন্য জান্নাতের সুপারিশ করার অধিকার দিবেন। এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظَّهَرَهُ ، فَأَحْلَلَ حَلَالَهُ ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

“হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করবে এবং কুরআনকে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবে। কুরআনে বর্ণিত হালালকে হালাল হিসেবে মেনে নেবে, হারামকে হারাম হিসেবে মেনে নেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং পরিবারের দশজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দিবেন যাদের সকলের ব্যাপারে জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে গিয়েছিলো।”

(সূনান আত-তিরমিযি)

পরকালীন জীবনে জান্নাত পাওয়ার জন্য এবং আল্লাহর কাছে উচ্চ মাকাম বা (উচ্চ মর্যাদা) পাওয়ার জন্য আমাদের সকলের আল-কুরআন অধ্যয়ন করা, নিজের জীবনে মেনেচলা এবং এই দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

আল-কুরআন শিক্ষার পথ হচ্ছে জান্নাতের পথ

আল-কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব এতই বেশী দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন শিক্ষার জন্য বা দ্বীন শিক্ষার জন্য যদি কেউ রাস্তায় বের হয় সে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেলো। এবং যতক্ষণ সে এ কাজ থেকে ফিরে না আসলো ততক্ষণ আল্লাহর রাস্তায় থাকলো। এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীন শিক্ষা করার জন্য বের হলো, সে আল্লাহর রাস্তায় বের হলো যতক্ষণনা সে ফিরে আসলো।” (সুনান আত-তিরমিযি)

দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের পথ হচ্ছে জান্নাতের পথ। তাই জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন ব্যক্তি রাস্তায় চলতে থাকলে এ পথে চলতে চলতে সে এক সময় জান্নাতের সন্ধান পেয়ে যাবে। আর এ পথে থাকা অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন। এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ َر: وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. ۞

“আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে; যাতে সে বিদ্যা অর্জন করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।” (সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী)

একাজন মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আল-কুরআন শিক্ষা করার জন্য সেখানে যাওয়া প্রয়োজন যেতে হবে, যত কষ্টই হোক সে কষ্ট করতে হবে, এর পরেও আল-কুরআন শিক্ষা করতে হবে।

কুরআন বিহীন শরীর বিরান বাড়ীর মত

আল-কুরআন এসেছে বিশ্ব মানবতার জীবনকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করতে। সত্যের সন্ধান দেওয়ার জন্য, অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য। তবে যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করবে না, কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করবে না, কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে না অর্থাৎ যে দেহের মধ্যে আল-কুরআনের আলো নেয় সেটা উজাড় বাড়ীর মত, ছাড়া বাড়ীর মত। একটা ছাড়া বাড়ীতে যেমন সাপ, বিচ্ছু, তেলাপোকা ইত্যাদি পোকা-মাকড় বসবাস করে। ঠিক তেমনি যে দেহের মধ্যে কুরআন নেই সেই দেহে শয়তান বাস করে। আল-হাদীসে এর সমর্থনে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم ۖ - إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ
مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

“হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যেই দেহের মধ্যে আল-কুরআনের কোন শিক্ষা নেই সেই দেহটা হচ্ছে উজাড় বাড়ীর মত।”
(সুনান আত-তিরমিযি)

তাই একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, জীবনের সকল কাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে আল-কুরআন শিক্ষা করা, তাহলেই শয়তান থেকে নিজেকে রক্ষা করা যাবে।

আল-কুরআনের কথা সঠিক কথা

আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আর আল-কুরআন হচ্ছে সেই ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র মানদ-। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

“নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদ- নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।” (সূরা হাদীদ-২৫)

আল-কুরআনই হচ্ছে সত্য কিতাব এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ বলেন,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“এটি (আল্লাহর) কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।” (সূরা আল-বাকারা-২) তাই সত্য কথা বলতে হলে, নেক আমল করতে হলে, ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আল-কুরআন জানতে হবে, আল-কুরআন বুঝতে হবে, আল-কুরআনকে মেনে চলতে হবে, আল-কুরআন দিয়ে বিচার-ফয়সালা করতে হবে। তাহলে উত্তম প্রতিদান পাওয়া যাবে। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدًى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“কুরআন দিয়ে যে কথা বলে সে সত্য কথা বলে, কুরআন থেকে যে আমল করে সে তার প্রতিদান পাবে, কুরআন দিয়ে যে বিচার-ফয়সালা করে সে ন্যায় বিচার করে এবং যে কুরআনের দিকে মানুষকে আহ্বান করে সে সঠিক পথের সন্ধান পায়।” (সূরান আত-তিরমিযি)

তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আল-কুরআন শিক্ষা করে এ শিক্ষার আলোকে সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা করা, ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সর্বপরি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল-কুরআনকে মেনে চলা।

কুরআন অধ্যয়নকারীকে আল্লাহ স্বরণ করেন

এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে আল-কুরআন অধ্যয়ন করা এবং সে অনুযায়ী জীবনে আমল করা। যারা দুনিয়ায় আল-কুরআন অধ্যয়ন করবে, জেনে-বুঝে আমল করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদেরকে স্বরণ করবেন এবং এই কুরআনের

সংস্পর্শে থাকার কারনে তাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে দিবেন। এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي قَالَ: "أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ أَرْزِينُ لِمَرْكَ كَلِّهِ " قُلْتُ: زِدْنِي قَالَ: "عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ"

“হযরত আবু যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুল (স.) এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি একটি লম্বা হাদীস বর্ণনা করলেন। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল (সা.) আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা ইহা তোমার সমস্ত আমলকে সৌন্দর্যমন্ডিত করবে। (আবু যার বলেন) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) আপনি আমাকে আরো অতিরিক্ত কিছু উপদেশ দিন। রাসুল (সা.) বললেন, তুমি কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্বরণ করবে, তাহলে আসমানে তোমাকে স্বরণ করা হবে এবং দুনিয়ায় এটা তোমার জন্য আলোকবর্তিকা হবে।” (বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান)

তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আল-কুরআন অধ্যয়ন করা এবং আল-কুরআনের শিক্ষা মেনে চলা। এর মাধ্যমে পরিবার, সমাজ আলোকিত হবে এবং জাহিলিয়াতের অন্ধকার দূরীভূত হবে।

আল-কুরআনের সম্মোহনি শক্তি

আল-কুরআন যাতে মানুষ মেনে চলতে না পারে সেজন্য প্রথম যুগ থেকেই মক্কার কাফেররা কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ

“আর কাফিররা বলে, ‘তোমরা এ কুরআনের নির্দেশ শুন না এবং এর আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যেন তোমরা জয়ী হতে পার।’” (সূরা হা-মীম- আস-সাজদা-২৬)

কাফেরদের বাধা অতিক্রম করে মক্কার সাধারণ মানুষ আল-কুরআনের তিলাওয়াত শুনতো এবং ইসলামের দিকে ধাবিত হতো। বর্ণিত আছে একদা হযরত ওমর (রা.) বাইতুল্লাহর পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন সে সময় রাসূল (সা.) নামাজের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, তাঁর মধুর তিলাওয়াত শুনে ওমর মনে মনে ভাবছে মুহাম্মদ কি কবি হয়ে গিয়েছে নাকি? এসময় রাসূল (সা.) তিলাওয়াত করলেন,

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ

“আর এটি কোন কবির কথা নয়। তোমরা কমই বিশ্বাস কর।” (সূরা হাক্কাহ- ৪১)

ওমর কুরআনের এ আয়াত শুনে মনে মনে ভাবলেন মুহাম্মদ আমার মনের কথা কিভাবে জানলো, তাহলে কি মুহাম্মদ গণক? এসময় রাসূল (সা.) তিলাওয়াত করলেন,

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ

“আর এটা কোন গণকের কথাও নয়। তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ কর।”

(সূরা হাক্কাহ- ৪২)

একথা শুনে ওমর হতবাক হয়ে ভাবছে এটা কবির কথা নাই, আবার গণকের কথা নাই, তাহলে মুহাম্মদ যেটা তিলাওয়াত করছে এটা কি? এমন সময় রাসূল (সা.) তিলাওয়াত করলেন,

نَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

“এটি জগতসমূহের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।” (সূরা হাক্কাহ- ৪৩)

এর পরেই হযরত ওমর ইসলামের আলোতে আলোকিত হয়ে রাসূল (সা.) এর কাছে এসে ইসলামে দিক্ষিত হন।

কুরআনের একটি আয়াত হলেও সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে:

আল-কুরআন শিক্ষা করা এবং সেটা মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া মুসলিম উম্মাহর উপরে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। এজন্য আল-কুরআন সঠিকভাবে অধ্যয়ন করে জানতে হবে এবং সে শিক্ষা সমাজের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আল-হাদীসে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه البخاري

“হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আমার পক্ষ থেকে জনগণকে (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দাও, যদিও সেটা একটি আয়াত হয়। বনী-ইসরাইল থেকে (শিক্ষণীয় ঘটনা) বর্ণনা করতে পার, তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত-ভাবে আমার প্রতি মিথ্যা (বা জাল হাদিস) আরোপ করল, সে যেন নিজ আশ্রয় জাহান্নামে বানিয়ে নিলো।” (সহীহ আল-বুখারী)

এটার মাধ্যমে আমাদের জন্য শিক্ষা হচ্ছে আল-কুরআন জানতে হবে এবং আল-কুরআনের শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। দ্বীনের এই দাওয়াত আল্লাহ আমাদের উপরে ফরজ করে দিয়েছেন। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।” (সূরা আলে-ইমরান-১০৪)

আল-কুরআন অমান্যকারীর পরিণতি

কুরআনের আয়াত অনুধাবন করে এর থেকে শিক্ষা গ্রহন করে জীবন পরিচালনা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে অবধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

“তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে?” (সূরা মুহাম্মদ-২৪) এ আয়াত আমাদেরকে বলে দিচ্ছে কুরআন অধ্যয়ন করে এর থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন পরিচালনা করতে হবে। তাহলে কুরআনের হুক আদায় হবে এবং আল্লাহ এর প্রতিদান দিবেন। আর যারা দুনিয়ার জীবনে কুরআন মেনে চলবে না, বরং কুরআনকে অবজ্ঞা করে চলবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অন্ধ করে উঠাবেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (১২৪) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (১২৫) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى

“আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, ‘হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন?’” (সূরা ত্বাহ- ১২৪-১২৬)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন,

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا

“আর যে ব্যক্তি এখানে (কুরআনের অনুসরণে) অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।” (সূরা বনি ইসরাইল-৭২)

তাই একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আল-কুরআন জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ আমাদের সাথে থাকবেন।

শেষ জামানায় কুরআনের আমল থাকবে না

রাসূল (সা.) ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটা সময় আসবে যখন আল-কুরআনের তিলাওয়াত থাকবে কিন্তু কুরআনের আমল সমাজের মানুষের মধ্যে থাকবে না। বর্তমান বিশেষ দিকে তাকালে মনে হয় সেই সময় চলে এসেছে। এখন সারা পৃথিবীতে কুরআনের তিলাওয়াত আছে কিন্তু কুরআনের আমল নেই, কুরআনের হুকুম সমাজে বাস্তবায়ন নেই। এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رِسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، عَلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَيْدِي السَّمَاءِ مَنْ عِنْدَهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ نَعُودٌ"

“হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, ভবিষ্যতে মানুষের সামনে এমন একটা যুগ আসবে যখন নাম ব্যতিরেকে ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, আল-কুরআনের আক্ষরিক তিলাওয়াত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তাদের মসজিদ গুলো হবে বাহ্যিক দিক দিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হবে হেদায়াত শূণ্য। আর তাদের আলেমরা হবে আকাশের নিচে জমিনের উপরে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। কারণ তাদের মধ্য থেকে ইসলাম/দ্বীন সম্পর্কে ফিতনা প্রকাশ পাবে। অতপর সেই ফিতনা তাদের দিকেই প্রত্যাবতন করবে।” (বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান অধ্যায়)

বর্তমান সময়ের মুসলামানগণ এই আল-কুরআনকে তিলাওয়াত সর্বস্ব কিতাবে পরিণত করেছি। এ কথার দ্বারা এটা মনে করার সুযোগ নেই যে, কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না। বরং কুরআন তিলাওয়াত করলে আপনি অবশ্যই প্রতি হরফে ১০টি করে নেকি পাবেন। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ

“যে ব্যক্তি আল-কুরআন তিলাওয়াত করবে প্রতিটি হরফের তার জন্য রয়েছে ১০টি করে সওয়াব।” (আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন)

তবে কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সে অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করা, পরিবার ও সমাজ পরিচালনা করাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। যদি আমি এই উদ্দেশ্য ভুলে শুধু তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকি অথচ আল-কুরআন সমাজে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা না করি তাহলে এটা তিলাওয়াত সর্বস্ব হিসেবে গণ্য হবে।

পরিশেষে বলা যায়, আল-কুরআনের হুকুম হচ্ছে তাকে তিলাওয়াত করতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে, বাস্তব জীবনে কুরআনের বিধান মেনে চলতে হবে। কারণ এই আল-কুরআনই কিয়ামতের দিন আপনার-আমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, **الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ** “আল-কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।” (আহকামুশ-শরীয়াহ) তাই আসুন আমরা সবাই আল-কুরআন শিক্ষা করি এবং কুরআন অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করি।

তথ্যসূত্র

<https://www.newszonebd.com/news/2023/%E0%A6%86%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%>

পবিত্র কোরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস

কুরআন সংকলনের পর্যায়সমূহ

প্রথম পর্যায়

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর যুগ:

অকাট্য দলীল দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, যখনই আল কুরআনের কোন অংশ নাযিল হত তখনই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা লিখিয়ে রাখতেন। কয়েকজন সাহাবী ওয়াহী লেখার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এঁদেরকে কাতিবুল ওয়াহী' বলা হয়। ওয়াহী লেখার ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করায় যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.) 'কাতিবুন নাবী' অভিধায় ভূষিত হয়েছিলেন। ইমাম বুখারী(র.) ফাদাইলুল কুরআন অধ্যায়ে 'কাতিবুন নাবী' নামে একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এবং এর অধীনে দুটো হাদীস উল্লেখ করেছেন:

প্রথম হাদীসঃ আবু বাকর (রা.), যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.)-কে বলেছেন,.. তুমি তো রাসূলুল্লাহর(ﷺ) নির্দেশে ওয়াহী লিপিবদ্ধ করতে ।

দ্বিতীয় হাদীস: যখন সূরা আন্ নিসার ৯৫ নং আয়াত নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ(ﷺ) বললেন, 'যায়িদকে ডাকো, সে যেন ফলক, দোয়াত ও হাড নিয়ে আসে।

মাক্কী জীবনেও রাসূলুল্লাহ(ﷺ) ওয়াহী লিখানোর ব্যবস্থা করতেন। মাক্কার ওয়াহী লেখকদের অন্যতম ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারহ; অবশ্য তিনি মুরতাদ হয়ে যান, পরবর্তীতে মাক্কা বিজয়ের দিন পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। চার খালীফাও ওয়াহী লিখতেন। সম্ভবত তাঁরা মাক্কী জীবনে ওয়াহী লিখতেন। মাক্কী জীবনে ওয়াহী লিপিবদ্ধ করার একটি প্রমাণ হল এই যে, ইসলাম গ্রহণের দিন 'উমার (রা.) সূরা তা-হা'র আয়াতগুলো তার বোনের কাছে পুস্তিকা আকারে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পেয়েছিলেন। সূরা আল বায়্যিনাহ-এ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ(ﷺ) গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ আল কুরআন আবৃত্তি করেন:

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً

আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত এক রাসূল, যে আবৃত্তি করে পবিত্র পুস্তিকাসমূহ

[আল কুরআন ৯৮:২]।

মাক্কী ও মাদানী জীবনে আরো যারা ওয়াহী লিখতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেনঃ আয যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.), খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনিল 'আস (রা.), আবান ইবনু সাঈদ ইবনিল 'আস (রা.), হানযালাহ ইবনুর রাবী' আল আসাদী (রা.), মু'আইকীব ইবনু আবি ফাতিমা (রা.), আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম (রা.), শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.), 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা.), মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান (রা.), উবাই ইবনু কা'ব (রা.), খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) ও সাবিত ইবনু কায়স (রা.) প্রমুখ।

রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর নির্দেশনা অনুসারে কাতিবগণ বিভিন্ন সূরার আওতায় আয়াতগুলোকে বিন্যস্ত করতেন। তিনি জিবরীল (আ.)-এর নির্দেশনার ভিত্তিতেই আয়াতের ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করতেন। উসমান ইবনু আবিল 'আস (রা.) বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম; হঠাৎ তিনি চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকালেন, কিছুক্ষণ পর চোখ নামিয়ে বললেন, “আমার কাছে জিবরীল (আ.) এসেছিলেন, তিনি নির্দেশ দিলেন এই আয়াত যেন এই সূরার এই জায়গায় স্থাপন করি।” সকল তথ্যাভিজ্ঞ ‘আলিম এ ব্যাপারে একমত যে বিভিন্ন সূরার আওতায় আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতা ওয়াহীর নির্দেশনার আলোকে সম্পন্ন হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে আয়াতগুলো যেভাবে বিন্যস্ত রয়েছে রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর যুগেও ঠিক সেভাবেই বিন্যস্ত ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ ‘আলিমগণের মতে সূরাগুলোর ধারাবাহিকতাও রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর নির্দেশনার আলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

কাতিবগণ রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর নির্দেশে কুরআন লিপিবদ্ধ করতেন। এটিকে সরকারী ব্যবস্থাপনা বলা যায়। অনেক কাতিব সরকারী অনুলিপির পাশাপাশি নিজেদের জন্য পৃথক অনুলিপি তৈরি করতেন। কাতিব ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীগণও নিজেদের পঠন-

পাঠনের সুবিধার্থে কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করতেন। এটি খুবই স্বাভাবিক যে, ব্যক্তিগত অনুলিপিগুলো পুরো আল কুরআন ধারণ করত না।

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর মৃত্যুর পূর্বেই পুরো আল কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল; তবে তা একত্রিত অবস্থায় ছিল না। আল কুরআন লিপিবদ্ধ ছিল খেজুরের ডাল, হাড়, কাঠফলক, চামড়া ও স্বচ্ছ পাথরে। তৎকালে এগুলোই ছিল লিখন উপকরণ। তাছাড়া বহু হাফিযের স্মৃতিতে পুরো আল কুরআন সংরক্ষিত ছিল। জিবরীল (আ.) প্রতি বছর একবার করে রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর কাছে আল কুরআন পেশ করতেন। রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর মৃত্যুর বছর তিনি দু'বার আল কুরআন উপস্থাপন করেছিলেন। আল কুরআনের কোন আয়াত বা বিধান রহিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলেই সম্ভবত রাসূলুল্লাহ(ﷺ) তাঁর জীবদ্দশায় আল কুরআন এক জায়গায় একত্র করেননি। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে আয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাবনা চিরতরে বিলীন হওয়ায় আল কুরআন সংকলনে আর কোন বাধা রইল না।

দ্বিতীয় পর্যায়

আবু বাকর (রা.)-এর আমল:

আবু বাকর (রা.)-এর আমলে আল কুরআন সংকলন সম্পর্কে কাতিবুল ওয়াহী যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.) বলেন:

ইয়ামামার যুদ্ধের সময় আবু বাকর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি এসে দেখলাম তাঁর কাছে উমার (রা.) উপস্থিত। আবু বাকর (রা.) বললেন, 'উমার (রা.) আমার কাছে এসে বলল, ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক হাফিযুল কুরআন শহীদ হয়েছেন। আমার আশঙ্কা হয় বিভিন্ন যুদ্ধের ময়দানে বিপুল সংখ্যক হাফিযুল কুরআনের শাহাদাতে আল কুরআনের বিরাট অংশ হারিয়ে যাবে। আমার অভিমত হচ্ছে আপনি কুরআন একত্রকরণের নির্দেশ দিন।' আমি (আবু বাকর) 'উমার (রা.)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ(ﷺ) যে কাজ করেননি আমি তা কিভাবে করব?' জবাবে উমার (রা.) বললেন,

‘আল্লাহর শপথ, এটি কল্যাণকর হবে।’ এরপর উমার (রা.) বারংবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, এমনকি আল্লাহ ঐ কাজ করার ব্যাপারে আমার অন্তর প্রশস্ত করে দিলেন যে ব্যাপারে ইতোপূর্বে উমার (রা.)-এর অন্তর প্রশস্ত করেছেন। যায়িদ (রা.) বলেন, অতঃপর আবু বাকর (রা.) বললেন, নিশ্চয় তুমি বুদ্ধিমান যুবক, তোমার সম্পর্কে কোন অভিযোগও নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর আমলে ওয়াহী লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং এবারও অনুসন্ধান চালিয়ে কুরআন সংকলন কর!

যায়িদ (রা.) আরো বলেন:

আল্লাহর শপথ! তাঁরা যদি আমার ওপর কোন পাহাড় স্থানান্তরের দায়িত্ব চাপাতো তাও আমার কাছে এতটা দুর্বল মনে হত না যতটা মনে হয়েছে কুরআন সংকলনের দায়িত্ব। আমি খেজুরের ডাল, পাথর ও হাড় এবং হাফিযদের স্মৃতির সঞ্চয় হতে কুরআন সংকলন করলাম। সূরা আত তাওবার শেষ দু’টো আয়াত পেলাম আবু খুযাইমা আল আনসারীর নিকট। একত্রিত ও সংকলিত কুরআনের কপি আবু বাকর (রা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁরই কাছে ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ‘উমার (রা.)-এর কাছে ছিল। উমার (রা.)-এর মৃত্যুর পর তা ছিল তদীয় কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা.)-এর নিকট।

যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.)-এর উক্তির আলোকে আবু বাকর (রা.)-এর আমলে কুরআন সংকলন

ক. আবু বাকর (রা.)-এর আমলে কুরআন সংকলনের কারণঃ

আবু বাকর (রা.)এর আমলে কুরআন সংকলনের কারণ এটি ছিল না যে কুরআন লিপিবদ্ধ ছিল না। ইতিপূর্বে দলীলসহ উল্লেখিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পুরো কুরআন লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন; তবে লিখিত অংশগুলো একত্রিত অবস্থায় ছিল না। আবু বাকর (রা.)-এর আমলে আরবের অনেকগুলো গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, অনেকে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, কেউ কেউ মিথ্যা নুবুওয়াত দাবি করে। ভণ্ড নাবীদের মাঝে সবচাইতে শক্তিশালী ছিল মুসাইলামাহ্ আল কায্যাব। আবু বাকর (রা.) তার বাহিনীর বিরুদ্ধে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী

প্রেরণ করেন। ইয়ামামার প্রচণ্ড যুদ্ধে মুসাইলামাহ্ পরাজিত ও নিহত হয়। তবে এই যুদ্ধে মুসলিমদের বিপুল প্রাণহানি হয়; কোন কোন বর্ণনা মতে সাত শতাধিক সাহাবী শহীদ হন যাঁদের অনেকে হাফিযুল কুরআন ছিলেন। চারজন সাহাবীর কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ(ﷺ) কুরআন তিলাওয়াত শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সালিম (রা.) ছিলেন তাঁদের একজন। ইয়ামামার যুদ্ধে সালিমও (রা.) শহীদ হন।

বিপুল সংখ্যক হাফিয সাহাবী বিশেষত সালিম (রা.)-এর মত অবিসংবাদিত কারীর মৃত্যুতে ‘উমার (রা.) যারপরনাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁর আশঙ্কা ছিল এই যে, হাফিয ও কারীগণের তিরোধানে কুরআনের কোন অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি আবু বাকর (রা.)-কে কুরআন একত্রীকরণ ও সংকলনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। প্রথমে আবু বাকর (রা.) ইতস্তত করেন এই কারণে যে, রাসূলুল্লাহ(ﷺ) যা করেননি তা তিনি করতে চান না। অবশ্য পরে আল্লাহ কুরআন সংকলনের পক্ষে তাঁর অন্তর প্রশস্ত করে দেন এবং তিনি উম্মাহর জন্য অত্যন্ত উপকারী পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন।

খ. কুরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পিত হয় কাতিবুল ওয়াহী যায়িদ (রা.)-এর ওপরঃ

আবু বাকর (রা.) কুরআন একত্রীকরণ ও সংকলনের এই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন কাতিবুল ওয়াহী যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.)-এর ওপর। এই গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য যায়িদ (রা.)-কে কেন বাছাই করলেন আবু বাকর (রা.) তাও পরিষ্কার করলেন তাঁর বক্তব্যে: “নিশ্চয় তুমি বুদ্ধিমান যুবক, তোমার সম্পর্কে কোন অভিযোগও নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর আমলে ওয়াহী লিপিবদ্ধ করতে।” এই উক্তি হতে যায়িদ (রা.)-এর উপযুক্ততার কারণগুলো পাওয়া যায়:

১. যায়িদ বয়সে তরুণ ছিলেন, তাঁর বয়স ছিল মাত্র একুশ; স্বভাবতই দায়িত্ব আনঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি তৎপর হবেন, এটি আশা করা যায়।

২. তিনি অধিক উপযুক্ত ছিলেন, যাঁকে আল্লাহ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন কল্যাণের পথ তাঁর জন্য সহজ হবে।

৩. যায়িদ (রা.) আস্থাভাজন ছিলেন, তাঁর ব্যাপারে কোন অভিযোগ ছিল না। সুতরাং এটা ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক যে তাঁর দায়িত্বে সম্পাদিত কাজ গ্রহণযোগ্য হবে।

৪. তিনি রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর কাতিবুল ওয়াহী ছিলেন; সুতরাং এই কাজে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, এই কাজ তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়।

গ. আল কুরআন সংকলনে যায়িদ (রা.)-এর কর্মধারা:

আবু বাকর (রা.), যায়িদ (রা.)-কে কুরআন সংকলনের পদ্ধতি সম্পর্কেও নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি উমার (রা.) ও যায়িদ (রা.)-কে বলেন, “তোমরা দু'জন মাসজিদের দরজায় বসো, কেউ আল্লাহর কিতাবের কোন অংশ দু'জন সাক্ষীসহ নিয়ে আসলে তোমরা তা লিপিবদ্ধ করবে।” এই নির্দেশনার আলোকে যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.) পুরো এক বছরের প্রচেষ্টায় আল কুরআন একত্রকরণ ও সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন। যায়িদ (রা.)-এর সংকলন পদ্ধতি এই ছিল যে, তিনি তখনই একটি আয়াত গ্রহণ করতেন যখন কেউ দাবি করত এটি সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে লিপিবদ্ধ করেছে। আবার শুধু মুখস্থ শক্তির ওপর নির্ভর করতেন না। লিখিত রূপের সাথে হাফিযদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত আয়াত মিলিয়ে নিতেন। কমপক্ষে দু'জনের কাছে লিখিত অবস্থায় পাওয়া গেলেই কেবল সেই আয়াত গ্রহণ করা হত। কেউ এটা দাবি করলেই যায়িদ গ্রহণ করতেন না যে এটি কুরআনের আয়াত; বরং তার সাথে দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন হতো, যারা সাক্ষ্য দেবে যে এই অংশটি রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর সামনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এভাবেই সতর্ক পদক্ষেপে ও সুচারু অনুসন্ধানে যায়িদ (রা.) কুরআন সংকলনের কাজ সম্পন্ন করেন। সূরা আত তাওবার শেষ দুটো আয়াত তিনি শুধু আবু খুযাইমাহ্ আল-আনসারী (রা.)-এর কাছে লিখিত অবস্থায় পান। এই অংশটি দ্বিতীয় কারো কাছে লিখিত না পাওয়া গেলেও যায়িদ (রা.) এটি গ্রহণ করেন। কারণ প্রকারান্তরে এই দুই আয়াতের পক্ষে দু'ধরনের সাক্ষী ছিল: হিফয ও লিখন। আয়াত দুটি যায়িদসহ অনেক সাহাবীর স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল, অবশ্য লিখিত অবস্থায় ছিল শুধু এক জনের কাছে। অতএব এই দু'টি যে কুরআনের অংশ সে বিষয়ে কোন সংশয় ছিল না।

ঘ. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর লিখন ও আবু বাকর (রা.)-এর লিখনের মধ্যে পার্থক্য:

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর আমলে পুরো কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তৎকালে লিখন সামগ্রী হিসেবে যা ব্যবহৃত হত যথা ফলক, খেজুর ডাল, হাড়, পাথর প্রভৃতির ওপর কুরআন লিপিবদ্ধ করা হত। তবে কুরআনের সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত এবং এক জায়গায় সংরক্ষিত ছিল না। আবু বাকর (রা.)-এর আমলে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করে একত্র করা হয়। বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়।

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এই বিষয়ে একমত যে আবু বাকর (রা.)-এর আমলে সংকলিত কুরআন হল সেটি যা জিবরীল (আ.), রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর কাছে তাঁর জীবনের শেষ বছরে উপস্থাপন করেছিলেন। আবু বাকর (রা.) এর মৃত্যুর পর কুরআনের কপিটি উমার (রা.)-এর কাছে রক্ষিত ছিল। তিনি আহত হয়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হলে আল কুরআনের কপিটি উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.)-এর নিকট গচ্ছিত রাখেন। কারণ তিনি কোন স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেননি। বরং ছয় সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচক পরিষদের হাতে পরবর্তী খালীফা নিয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

তৃতীয় পর্যায়

উসমান (রা.)-এর আমলে কুরআন সংকলনঃ

ক. উসমান (রা.)-এর আমলে কুরআন সংকলনের হেতু:

বিশিষ্ট সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) উসমান (রা.)-এর আমলে সিরিয় ও ইরাকী যোদ্ধাদের সাথে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নানা অঞ্চলের মানুষের কুরআন পাঠের ভিন্নতা দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন, কেউ ইবনু মাসউদ (রা.)-এর অনুসরণে কুরআন তিলাওয়াত করে, আবার অন্যরা আবু মূসা আল-আশ'আরীর (রা.) কিরাআত তিলাওয়াত করে। শুধু তাই নয়, এক দল অন্য দলকে হেয়জ্ঞান করে। এই অবস্থা

দেখে তিনি বললেন, “কূফাবাসী বলে: ইবনু মাসউদের কিরাআত, বাসরাবাসী বলে: আবু মূসার কিরাআত। আল্লাহর শপথ! আমি আমীরুল মু'মিনীনের কাছে গিয়ে অনুরোধ করব তিনি যেন সবাইকে একই পঠনপদ্ধতির ওপর একত্রিত করেন।” অভিযান শেষে মাদীনায় এসে হুযাইফা (রা.) উসমান (রা.)-কে বললেন, “আমীরুল মু'মিনীন! ইয়াহুদী ও নাসারাদের মত নিজেদের কিতাবের ব্যাপারে মতভেদ করার পূর্বেই আপনি এই উম্মাহকে সামলান।”

পঠনপদ্ধতির ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন কারীর ছাত্রদের মাঝে বচসার বিষয়টি উসমান (রা.) মাদীনায়ও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একবার তিনি মাসজিদে খুতবা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, “তোমরা আমার সামনেই মতভেদ কর, না জানি দূরে যারা আছে তারা কী করে?”

খ: কুরআন সংকলনের বিষয়ে সাহাবীদের সাথে উসমান (রা.)-এর পরামর্শ:

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)-এর আরজটি উসমান (রা.) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিলেন। করণীয় নির্ধারণে তিনি মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণকে একত্রিত করলেন; উম্মাহ-এর শ্রেষ্ঠ ‘আলিম, ফকীহ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি এঁদের মাঝেই ছিলেন, যাদের শীর্ষে ছিলেন ‘আলী ইবনু আবু তালিব (রা.)। তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এই অবস্থা দীর্ঘায়িত হতে দেয়া যায় না, মুমিনদের অন্তরে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় যেন প্রবেশ না করতে পারে। তাঁরা হাফসা (রা.)-এর কাছে রক্ষিত সাহীফাগুলো হতে অনুলিপি প্রস্তুত করে কুরআনের বিশুদ্ধ কপি ইসলামী খিলাফাতের নানা স্থানে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত অনুসারে খালীফা, উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.)-এর কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, “আমার কাছে কুরআনের অংশগুলো পাঠিয়ে দিন, আমি কয়েকটি অনুলিপি তৈরী করে মূল কপিগুলো আপনার কাছে ফেরত পাঠাবো।” হাফসা (রা.) তাঁর কাছে রক্ষিত আল কুরআনের সাহীফাগুলো উসমান (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন।

গ. কুরআন সংকলনের জন্য চার সদস্যের কমিটি গঠন:

উসমান (রা.) চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করলেন, যার সদস্যরা ছিলেন: যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.), 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.), সাঈদ ইবনুল আস (রা.) ও 'আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনি হিশাম (রা.)। তাদেরকে আবু বাকর (রা.)-এর সাহীফাগুলোর আলোকে কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। কমিটির সদস্যদের মাঝে যায়িদ (রা.) ছিলেন আনসারী, বাকি তিনজন ছিলেন কুরাইশী। তিনজনের কুরাইশ দলকে 'উসমান (রা.) বললেন,

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم
কুরআনের কোন শব্দের আরবীত্বের ব্যাপারে যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.)-এর সাথে তোমাদের মতভেদ হলে তোমরা তা কুরাইশী ভাষায় লিপিবদ্ধ কর; কারণ এই কিতাব তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে।”

২৫ হিজরীতে কমিটির সদস্যরা কাজ শুরু করেন। চার সদস্যের কমিটির সবাই হাফিযুল কুরআন হলেও তাঁরা হাফসার (রা.) কাছ থেকে আনীত সাহীফাগুলোর ওপর ভিত্তি করে কুরআনের কয়েকটি অনুলিপি প্রস্তুত করলেন। উসমান (রা.) কোন কোন শব্দের আরবীত্বের ব্যাপারে মতভেদের আশঙ্কা করেছিলেন; তবে একটি মাত্র শব্দ নিয়ে যায়িদ (রা.) ও কুরাইশী সংকলকদের মাঝে কোন বিষয়ে মতভেদ হয়েছিলো বলে জানা যায়। শব্দটি হল 'তাবূত' (التابوت) মাদীনার আনসারদের উপভাষায় এটির পাঠ ছিল 'তাবূহ' (التابوه)। এ বিষয়ে উসমান (রা.)-এর কাছে নির্দেশনা চাওয়া হলে তিনি 'তাবূত' লিখতে বলেন।

'উসমান (রা.)-এর আমলে সংকলিত আল কুরআনে আয়াত বা সূরার ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন আনা হয়নি। আবু বাকর (রা.)-এর সংকলনে যে ধারাবাহিকতা ছিল সেটিই হুবহু বহাল ছিল উসমান (রা.)-এর সংকলনে। তাছাড়া কোন শব্দে কোনরূপ পরিবর্তন আনা হয়নি, সেটি সম্ভবও ছিল না। কুরআন সংকলনকালে ইবনু যুবাইর (রা.), উসমান (রা.)-কে বলেছিলেন, 'সূরা আল বাকারার ২৪০ নং

আয়াতটি তো অন্য আয়াত দ্বারা (একই সূরার ২৩৪ নং আয়াত দ্বারা) মানসূখ হয়ে গেছে, তবে কেন আপনি সেটি বহাল রাখছেন? জবাবে ‘উসমান (রা.) বললেন,

يا ابن أخي لا أغير شيئاً من مكانه

ভাতিজা, আমি (আল কুরআনের) কোন কিছু স্বস্থান হতে পরিবর্তন করতে পারি না।” খালীফার এই জবাব হতে বুঝা যায়, কোন আয়াত বাদ দেয়া তো দূরের কথা, কোন আয়াতের স্থান পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়নি। মৃত্যুর পূর্বে রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর সামনে জিবরীল (রা.) পুরো কুরআন উপস্থাপন করেছিলেন। আবু বাকর (রা.)-এর সংকলনটি সেই উপস্থাপনার অনুরূপ, আবার ‘উসমান (রা.)-এর সংকলনটি ছিল আবু বাকর (রা.)-এর সংকলনের অনুরূপ। এখানে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোন ক্ষমতা কারো ছিল না।

ঘ. বিভিন্ন প্রদেশে কারী ও কুরআনের কপি প্রেরণঃ

গ্রন্থাকারে কুরআনের অনুলিপি তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে ‘উসমান (রা.) মূল কপির পৃষ্ঠাগুলো হাফসা (রা.)-এর কাছে ফেরত পাঠালেন এবং অনুলিপিকৃত কুরআনের এক একটি কপি দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রেরণ করলেন। এই কপিগুলোতে হারাকাত বা স্বরচিহ্ন এবং নুজ্জা ছিল না। ফলে কুরআনের শব্দগুলো বিভিন্নভাবে তিলাওয়াত করার সুযোগ ছিল। এ কারণে উসমান (রা.) কুরআনের অনুলিপি প্রেরণের পাশাপাশি কারীও প্রেরণ করেন, যাতে তারা জনগণকে একই পদ্ধতির কিরাআতের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

উসমান (রা.) বিভিন্ন শহরে আল কুরআনের কয়টি কপি পাঠিয়েছিলেন?

বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত মুসহাফের (কুরআনের কপি) সংখ্যার বিষয়ে মতভেদ আছে। অধিকাংশ ‘আলিম বলেন, ‘উসমান (রা.) চারটি মুসহাফ প্রস্তুত করেছিলেন। মাদীনায় একটি মুসহাফ রেখে বাকিগুলো সিরিয়া, কূফা ও বাসরায় পাঠানো হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, উপযুক্ত চারটির পাশাপাশি কুরআনের আরেকটি কপি মাক্কাবাসীদের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। আবার কারো মতে, প্রেরিত মুসহাফের সংখ্যা ছয়; পূর্বোক্ত পাঁচটি

এবং আরেকটি পাঠিয়েছিলেন বাহরাইনে। যাঁরা বলেন, সাতটি মুসহাফ প্রেরণ করা হয়েছিল তাঁরা বলেন সপ্তম কপিটি ইয়ামানে পাঠানো হয়েছিল। প্রেরিত মুসহাফের সংখ্যা আট বলেও একটি মত পাওয়া যায়, সেমতে অষ্টম মুসহাফটি উসমান (রা.) নিজের কাছে রেখেছিলেন। শাহাদাতের সময় তিনি সেটি তিলাওয়াত করছিলেন। প্রতিটি মুসহাফের সাথে একজন করে কারীও প্রেরণ করা হয়, যার দায়িত্ব ছিল বিশুদ্ধ তিলাওয়াত পদ্ধতি প্রশিক্ষণ দেওয়া। আবদুল্লাহ ইবনু সাইব (রা.)-কে মাক্কায়, আল-মুগীরা ইবনু শিহাবকে সিরিয়ায়, আবু আবদিল্লাহ আস-সুলামীকে কুফায়, ‘আমির ইবনু কায়সকে বাসরায় প্রেরণ করা হয়। যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.)-কে মাদীনার অধিবাসীদেরকে কিরাআত প্রশিক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়।

ঙ. কুরআনের অন্য কপিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশঃ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ(ﷺ) সরকারীভাবে কুরআনের প্রতিটি আয়াত লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। পাশাপাশি অনেক সাহাবী ব্যক্তিগত অধ্যয়নের জন্য কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ করতেন। এই অনুলিপিগুলো পূর্ণাঙ্গ ছিল না। তাছাড়া কুরআনের বাণী উপলব্ধির সুবিধার্থে অনেক সময় সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের ব্যক্তিগত অনুলিপিতে আয়াতের পাশাপাশি কোন কোন শব্দের ব্যাখ্যাও লিখে রাখতেন। খালীফা কর্তৃক রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআনের বিশুদ্ধতম ও পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি তৈরি করার পর ব্যক্তিগত কপিগুলো বহাল রাখার উপায় ছিল না। কারণ এতে বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ ছিল। প্রয়োজনে স্ট্যান্ডার্ড কপি হতে অনুলিপি করার সুযোগ ছিল। তাই ‘উসমান (রা.) নির্দেশ দিলেন মাদীনা হতে প্রেরিত মুসহাফ ব্যতীত কুরআনের অন্যান্য কপিগুলো যেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনের কপিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার পূর্বে পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলা হয়েছিল। এভাবে আল্লাহর কালাম পাঠে মতভেদ করা হতে মুসলিম উম্মাহ পরিব্রাণ লাভ করে।

চ. সাহাবায়ে কিরামের ইজমা':

সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কুরআন সংকলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাঁরা 'উসমান (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তে বিমোহিত হয়ে বলেছিলেন, “আপনার সিদ্ধান্ত কতই না উত্তম”, এবং “তিনি চমৎকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।”

মুসআব ইবনু সা'দ সাহাবায়ে কিরামের যুগ পেয়েছেন। তাঁর মন্তব্য হল এই যে, কুরআন সংকলনে উসমান (রা.)-এর সিদ্ধান্তে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। কুরআন সংকলনের কারণে যারা উসমান (রা.)-এর সমালোচনা করতো, তাদেরকে 'আলী (রা.) বলতেন,

يا أيُّها الناس ! لا تغلوا في عثمان، ولا تقولوا له إلا خيراً - أو قولوا خيراً - فوالله ما فعل
الَّذِي فعل - أي في المصاحف - إلا عن ملاءمًا جميعاً؛ أي: الصَّحَابَةُ... والله لو وُلِّيتُ؛
لفعلت مثل الذي فعل.

ওহে জনগণ, উসমান (রা.)-এর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না, তাঁর সম্পর্কে ভাল বৈ অন্য কিছু বলো না। আল্লাহর শপথ, কুরআন সংকলনের ব্যাপারে তিনি তো আমাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আল্লাহর শপথ, আমি যদি দায়িত্বে থাকতাম তবে অনুরূপ সিদ্ধান্তই নিতাম।

আল-কুরতুবী (রাহ.) স্বীয় তাফসীরে বলেন, উসমান (রা.) এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে। রাসূলুল্লাহ(ﷺ) হতে যা বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত তা গ্রহণ এবং অন্যগুলো বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁরা উসমান (রা.)-এর সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করেছিলেন আর এটি ছিল যথার্থ ও সঠিক।

ছঃ আবু বাকর (রা.)-এর সংকলন ও 'উসমান (রা.)-এর সংকলনের মাঝে পার্থক্যঃ

ইবনুত্ তীন (রাহ.) বলেন, আবু বাকর (রা.)-এর আমলে কুরআন সংকলন করা হয়েছিল এই কারণে যে, তিনি কারীদের তিরোধানে আংশিকভাবে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা করেছিলেন; কারণ এই মহাগ্রন্থ এক স্থানে একত্রিত অবস্থায় ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর নির্দেশনা অনুসারে সূরাসমূহের আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে

সাজিয়ে কুরআন সংকলন করেন। উসমান (রা.)-এর আমলে কুরআনের পাঠপদ্ধতি নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়; আরবী ভাষার বিভিন্ন উপভাষায় কুরআন তিলাওয়াতের সুযোগ থাকায় লোকজন নিজস্ব উপভাষায় কুরআন তিলাওয়াত করত এবং অন্য উপভাষায় তিলাওয়াতকারীদেরকে ভুল সাব্যস্ত করত। এই প্রবণতার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে উসমান (রা.) সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে আবু বাকর (রা.)-এর সংকলন হতে আল কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করেন। আরবী ভাষার অন্যান্য উপভাষায় তিলাওয়াতের সুযোগ রহিত করে কেবল কুরাইশী আরবী ভাষায় আল কুরআন সংকলন করা হল। প্রাথমিক যুগে শিক্ষার অনগ্রসরতার কারণে বিভিন্ন গ্রোত্রের লোকদের তিলাওয়াতের সুবিধার্থে নানা উপভাষায় কুরআন তিলাওয়াতের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে আরব গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ করে এবং পরস্পরের কাছাকাছি আসায় ভাষার দূরত্ব দূর হয় এবং কুরাইশী ভাষা মানভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই, কুরআন তিলাওয়াতের অভিন্নতার সুবিধার্থে অন্যান্য উপভাষায় তিলাওয়াতের সুযোগ রহিত করে কেবল কুরাইশী ভাষায় কুরআন সংকলন করা হয়।

জ: সাহীফা ও মুসহাফ:

সাহীফুল বুখারীর বর্ণনায় আবু বাকর (রা.)-এর আমলের কুরআনের সংকলন বুঝাতে ‘সাহীফা’ ও উসমান (রা.)-এর আমলের সংকলন বুঝাতে ‘মুসহাফ’ উল্লেখ করা হয়েছে। [27] আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, “তারা (সংকলকবৃন্দ) যখন সাহীফাগুলো (صحف) কপি করে মুসহাফ প্রস্তুত করলেন তখন উসমান (রা.) সাহীফাগুলো হাফসা (রা.)-এর কাছে ফেরত পাঠান এবং প্রতি প্রান্তে এক একটি মুসহাফ (مصحف) প্রেরণ করেন।” আরবী শব্দ ‘সাহীফা’-এর অর্থ হল ক্ষুদ্র গ্রন্থ বা পুস্তিকা। অপরদিকে ‘মুসহাফ’ এর অর্থ হল: দুই মলাটের মাঝে একত্রিত ও বাধাইকৃত পুস্তিকাসমূহ (সাহীফাসমূহ)। আল-বুখারীর(র.) শব্দ চয়ন হতে প্রতীয়মান হয় আবু বাকর (রা.)-এর আমলে কুরআনের সূরাগুলো পুস্তিকা বা ছোট বই-এর আকারে লিপিবদ্ধ করে সেগুলোকে এক স্থানে একত্র করা হয়েছিল, তবে দুটি মলাটের মাঝে সেগুলোকে বাঁধাই করা হয়নি। পক্ষান্তরে উসমান (রা.)-এর আমলে পুরো কুরআনের কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করে

প্রত্যেকটিকে বইয়ের মত করে বাঁধাই করা হয়েছিল। এজন্য আবু বাকর (রা.)-এর সংকলন বুঝাতে সাহীফাসমূহ এবং উসমান (রা.)-এর সংকলন বুঝাতে মুসহাফ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

ঝঃ মুসহাফে উসমান সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ(রা.)-এর ভূমিকাঃ

কুরআন সংকলনের ব্যাপারে ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ(রা.) উসমান (রা.)-এর বিরোধিতা করেছিলেন এমন কোন বিষয় বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। এই ধরনের কল্পিত কাহিনীর উৎস হল দুর্বল রিওয়াযাত। অবশ্য সবক’টি দুর্বল রেওয়াযাতে এটাও বলা হয়েছে যে, ইবনু মাসউদ(রা.) সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যের সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে আসেন। শুধু তাই নয় তিনি এ বিষয়ে সাধারণ্যে ঘোষণাও প্রদান করেন এবং লোকদেরকে ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “আল্লাহ টেনেহিচড়ে ‘ইলম উঠিয়ে নেবেন না, বরং তিনি ‘আলিমগণের তিরোধানের মাধ্যমে ‘ইলম উঠিয়ে নেবেন। উম্মতে মুহাম্মাদ ভ্রান্তির ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। তাঁরা যে বিষয়ে একমত হয়েছেন সত্য অবশ্যই সেখানে থাকবে।” এই বক্তব্যটুকু ইবনু মাসউদ (রা.) লিখিতভাবে উসমান (রা.)-কে অবহিত করেন। ইবনু কাসীর(র.) ইবনু মাসউদের(রা.) ঐকমত্যে ফিরে আসার কথা উল্লেখ করেছেন। আয-যাহাবী(র.) জোর দিয়ে বলেন, “শেষাবধি উসমান (রা.)-এর কর্মপদ্ধতিতে ইবনু মাসউদ (রা.) সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছেন।”

কুরআন সংকলন ও উসমান (রা.)-এর সাথে ইবনু মাসউদের সম্পর্ক বিষয়ে তাহা হুসাইন কিছু উদ্ভট কথা বলেছেন। তিনি প্রাচ্যবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন মন্তব্য করেছেন। কিছু লেখক আছেন যারা দুর্বল ও ইমামিয়া (শিয়া) বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে মনগড়া মন্তব্য করেছেন।

ইবনু মাসউদ(রা.), যিনি মতভেদ ও ফিতনার ভয়ে এবং খালিফার আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য মিনায় নামায কসর না করে পূর্ণরূপে আদায় করেছেন, তিনি মিস্বারে আরোহন করে খালীফার বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়েছেন- এটা যুক্তিযুক্ত নয়।”

কতিপয় ঐতিহাসিক ইবনু মাসউদের (রা.) নামে মিথ্যারোপ করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। এইসব বর্ণনা সুস্থ বিবেকের কাছে অগ্রহণযোগ্য। কেউ কেউ মিথ্যামূলকভাবে বলেছেন, ইবনু মাসউদ (রা.), উসমান (রা.)-কে কাফির সাব্যস্ত করেছেন এবং খালীফাও তাকে প্রহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি একটি চরম মিথ্যাচার; বর্ণনার পণ্ডিতগণ জানেন যে, ইবনু মাসউদ (রা.) খালীফাকে কাফির প্রতিপন্ন করেননি। বরং উসমান (রা.)-এর হাতে বাই'আত করার পর তিনি মাদীনা হতে কূফা গমন করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, “আমিরুল মু'মিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) মারা গেছেন, আমরা সাহাবায়ে কিরাম ঐকমত্যের ভিত্তিতে উসমান (রা.)-এর হাতে বাই'আত করেছি।”

তথ্যসূত্র

<https://response-to-anti-islam.com/show/%E0%A6%86%E0%A6%B2-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8-/254>

বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পবিত্র কুরআন মানব জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয়, জাগতিক, ও পারলৌকিক জীবনের দিক-নির্দেশনার প্রধান উৎস। এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বৈজ্ঞানিক উপাত্ত সংবলিত একটি সংবিধান। এর বহু আয়াত ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। একমাত্র গবেষণার মাধ্যমেই এর যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষী মনীষীরা যুগে যুগে স্বভাষায় কুরআন চর্চা করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষী প্রতিযোজনা মুসলিম ও অমুসলিম পণ্ডিতবর্গ এবং কবি সাহিত্যিকরাও বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর চর্চা করে কুরআনী সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। কুরআনী সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী রচনা ও সাময়িক পত্রে কুরআন চর্চা প্রভৃতি বিষয়ে তাদের অবদান অবিস্মরণীয়।

পবিত্র কুরআনের ভাষান্তর সূচনা

পবিত্র কুরআন মানব জীবনের পার্থিব ও পরলৌকিক বিষয়সহ সর্ব বিষয়ে সকল প্রকার দিক-নির্দেশনার প্রধান উৎস। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) -র উপর অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্ব যুগে যুগসমস্যার যুগোপযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান সম্বলিত একটি অতুলনীয় জীবন বিধান। এ কুরআন হলো তাঁর রিসালাতের চিরন্তন ও চূড়ান্ত সাক্ষী। এতে স্রষ্টার সৃষ্টিকুলের সর্ব বিষয়ের বিবরণ নিহিত রয়েছে। এ কুরআনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের পথ-নির্দেশক। পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবী। কুরআন নাজিল হওয়ার সময় থেকে অদ্যাবধি এ আরবি কুরআন থেকে মানুষ যেভাবে দিক নির্দেশনা পেয়ে আসছে অনাগত কালের সকল শ্রেণীর মানুষ অনুরূপ দিশা পাবে। কারণ, আল্লাহ স্বয়ং এ পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের নিশ্চয়তার বিধান দিয়েছেন। এ কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হলেও এর আবেদন ও আহ্বান সর্বজনীন।

হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ও সমগ্র মানবজাতির হিদায়াতের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত। ফলে তাঁর উপর যখনই পবিত্র কুরআনের যতটুকু অবতীর্ণ হতো তখনই তা তার আশেপাশের লোকদের হিদায়েতের উদ্দেশ্যে শুনিয়ে দিতেন। কারন, এটা ছিল তাঁর রিসালাতের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি তার দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি করেনি। বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিগণ রাসূল (ﷺ) এর দরবাতে উপস্থিত হতেন। আর তিনি তাদের প্রত্যেকের ভাষা অনুযায়ী অনুবাদ করেন বুঝাতেন। ফলে তাঁর জীবদ্দশায়ও বিভিন্ন ভাষী মানুষ ভাষান্তরের মাধ্যমে তাদের নিজ ভাষায় কুরআন অনুধাবনে সক্ষম হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, মক্কায় ইসলাম প্রচারে যখন রাসূল (ﷺ) তীব্র বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন সেখানে একজন আজমী (ইরানি) বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন দ্বিভাষী। কুরআন শুনা মাত্রই তিনি নিজে বুঝার জন্য অবচেতনে তা ফার্সিতে অনুবাদ করে নিতেন। তিনি কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের পরোক্ষ অনুবাদের ধারা

তুর্কীবীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষণ সেনকে লখনৌ থেকে বিতাড়িত করে বাংলা জয় করেন। এবং বিজিত অঞ্চলে সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাত হেনে বাংলা ভাষা চর্চার পথ উন্মুক্ত করেন। তার এই বিজয়ের পর থেকেই মুসলমানদের সাথে বাংলা ভাষার একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানরা বঙ্গ দেশে মসজিদ, খানকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করে তাদের ধর্ম কর্ম সম্পাদন করতে থাকেন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে দেশবাসীর প্রতি ইসলাম ধর্ম প্রচার ও ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাবলী রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। মধ্যযুগীয় কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর এদের অন্যতম। মাতৃভাষায় কুরআনী সাহিত্য চর্চার গুরুত্বটি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগের কবি সৈয়দ সুলতানের (১৫৫০-১৬৪৮) ‘ওফাতে রসূল’ নামক কাব্য গ্রন্থেও প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের প্রত্যক্ষ বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর

১৭৩৭ খৃস্টাব্দে দিল্লীর শাহ ওয়ালীউল্যাহ ফার্সি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেন। এর ৬১ বছর পর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ১৮০৮/১৮০৯ খৃস্টাব্দে আমপারার একটি প্রত্যক্ষ বঙ্গানুবাদ প্রকাশের সন্ধান পাওয়া যায়। অনুবাদক ছিলেন রংপুরের মটুকপুর নিবাসী আমির উদ্দীন বসুনিয়া। এ খন্ডিত অনুবাদটি ছিল বাংলা পুঁথি সাহিত্যের ভাষায় আমপারার কাব্যানুবাদ। শাহ ওয়ালীউল্যাহ অনুবাদের ১৪৪ বছর পর ব্রাহ্মণধর্মাবলম্বী গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) কর্তৃক বঙ্গানুবাদিত সম্পূর্ণ কুরআন প্রকাশিত হয় ১৮৮১-১৮৮৫ খৃস্টাব্দে। আমির উদ্দীন বসুনিয়ার পর কুরআনের বঙ্গানুবাদে এগিয়ে আসেন কলকাতার পাটওয়ার বাগানের মির্জাপুর মহল্লার অধিবাসী আকবর আলী। বৃটিশ ভারতের অধিবাসী রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০), খৃস্টান পাদ্রী তারাচরণ বন্দোপাধ্যায়, টাঙ্গাইলের মাওলানা নঈমুদ্দিন (১৮৩২-১৯০৮), দিনাজপুরের আকবর উদ্দিন, বৃটিশ ভারতের অধিবাসী একজন দেশীয় খৃষ্টান শ্রী ফিলিপ বিশ্বাস, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এদের মধ্যে গিরিশ চন্দ্র সেনের বঙ্গানুবাদটি ছিল পূর্ণাঙ্গ আর অন্যদের অনুবাদ ছিল খন্ডিত। গিরিশ চন্দ্র সেনের অনুবাদটি অনেকটা আক্ষরিক পর্যায়ে। এতে টীকা-টিপ্পনী সংযুক্তির ফলে এটাকে অর্থানুবাদ বললেও অতুষ্টি হবে না। এর ভাষা প্রাঞ্জল। তবে সংস্কৃত শব্দের প্রভাবও কম নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন হিসেবে বিভিন্ন মুসলিম পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের কর্তৃক অনুবাদটি প্রশংসিত হলেও অনুবাদটি ত্রুটি মুক্ত নয়। উদাহরণ স্বরূপ সূরা ইখলাসের ‘আস সামাদ’ শব্দের অনুবাদটি লক্ষণীয়। তিনি শব্দটির অনুবাদ করেছেন ‘নিষ্কাম’ অথচ এর সঠিক অর্থ হবে ‘অমুখাপেক্ষী’। তিনি তার অনূদিত কুরআনের বিভিন্ন স্থানে স্বধর্মের প্রভাব বিস্তারেও প্রয়াসী হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সূরা হুমাযার অনুবাদের একটি টীকা লক্ষণীয়। তিনি বলেন “এই সূরাতে নরক যে বাহিরে নয়, অন্তরে ইহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে”। *গিরিশ চন্দ্র সেন (অনূদিত) কোরআন শরীফ (কলকাতা হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৯) আকবর আলীর অনুবাদটি ‘তরজমা আমছে পারা’ নামে বাংলা পুঁথি সাহিত্যের ভাষায় একটি কাব্যানুবাদ। এটি কলকাতা থেকে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাঙালি

মুসলমানদের মধ্যে মাওলানা নঈমুদ্দীন সর্বপ্রথম কুরআনের বঙ্গানুবাদ সহ ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর অনূদিত কুরআন হতে ১ম থেকে ৯ম পারা পর্যন্ত তাঁর জীবদ্দশায় (১৮৮৭-১৯০৮) খৃস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অতঃপর তাঁর পুত্রগণও তাঁর অনুসরণ করে ২৩ পারা পর্যন্ত কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য ১৯০৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশ করেন। শ্রীফিলিপ বিশ্বাসের অনুবাদটি ছিল খৃস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। অনুবাদটি ১৮৯১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হলে তৎকালীন জনতার প্রতিবাদের মুখে বৃটিশ সরকার তা বাজেয়াপ্ত করেন।

উনিশ শতকে বাঙালি মুসলিম পন্ডিত ও সাহিত্যিকদের ধর্মপ্রচারক ও কুরআনি সাহিত্য চর্চার ফলে মুসলমানদের স্বধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ উজ্জীবিত হয়েছিল। এ সময় খৃস্টান, আর্য, ব্রাহ্মধর্মের পন্ডিতদের লিখনি দ্বারা স্বধর্ম প্রচারে তৎপরতা লক্ষ করা যায়। তখন এ সময় মুসলিমদের ক্ষুরধারা লিখনীও ইসলামের মহাত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে এবং মুসলিম চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ রক্ষায় সক্রিয় ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও এ মুসলিম চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ অব্যাহত থাকে। বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারায় এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ অঞ্চল ভারতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কুরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য চর্চায় যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯২৩), মাওলানা তসলিমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭), আবুল ফজল আবদুল করিম (১৮৭৫-১৯৪৭), মুহাম্মদ আব্দুল হাকীম (১৮৮৭-১৯৫৭), ও মুহাম্মদ আলী হাসান, মাওলানা ওসমান গনি ও ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (রহ.)। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সর্বশেষে কুরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ হলেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (রহ.)। তবে তাঁর অনুবাদ আজও প্রকাশ হয়নি। “মহাবানী” নামে এর মাত্র ১০ টি সূরার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী মুসলিম পন্ডিত ও কবি সাহিত্যিকদের অনেকেই বাংলা গদ্যে ও কাব্যাকারে কুরআনের খন্ডিত অনুবাদ ও ভাষ্য লিখনে অবদান রেখেছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন অমুসলিম পন্ডিত অনুবাদকও রয়েছেন। বাংলা ভাষায় কুরআনি সাহিত্য চর্চায় এই সব অনুবাদ খন্ডিত অনুবাদ ও প্রকাশিত অনুবাগুলোর নিম্নোক্ত

মুসলিম ও অমুসলিম পণ্ডিত, কবি-সাহিত্যিক ও তাঁদের কৃত অনুবাদগুলো উল্লেখযোগ্য। আবদুল মজিদ অনূদিত ‘কোরান শরীফ’ (১৯০৭), শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ (১৮৮৫-১৯৪২), আমপারা কাব্যানুবাদ (১৯০৮), মুন্সী করিম বক্স (১৮৭৫-১৯৪৭) অনূদিত ‘কোরান শরীফ’ ১ম পারা (১৯১৬) ও আমপারা (১৯১৮), মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন (১৮৭৫-১৯৪৫) অনূদিত ও ব্যাখ্যাত ‘কোরান শরীফ’ ১ম, ২য়, ৩য় পারা ও ‘আমপারা’ (১৯১৭-১৯৩০), এয়ার আহমদ এল টি (মৃ.১৯৪৪) এর ‘আমপারার বাঙ্গলা তফছির, (১৯২০), আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর (১৮৭৯-১৯৫১) গদ্যে ও পদ্যে অনূদিত ‘মহাকোরান কাব্য’-আমপারা (১৯২৭), মীর ফজল আলীর (১৮৯৮-১৯৩৯) ‘কোরান কণিকা’ (১৯৩০), আবদুল ওয়াসেক (১৮৭১-১৯৪৬) অনূদিত ‘আমপারা’ (১৯৩৩), কবি মুহাম্মদ আবু বকর (১৯১২-১৯৭৩) অনূদিত ‘আমপারা’ (১৯৩৩), কাজী নজরুল ইসলামের (১৯৯৯-১৯৭৬) ‘কাব্য আমপারা’ (১৯৩৩), মোহাম্মদ গোলাম আকবরের (মৃ.১৯৫৬), ‘আমপারার তফসির’ (১৯৩৬), মুহাম্মদ ইব্রাহিম (১৮৭৭-১৯৪০) অনূদিত ‘আমপারা’-১ম ও ২য় সোপান (১৯৩৬-১৯৩৮), আবদুর রশীদেদ ‘সরল আমপারা’ (১৯৩৯) নূর মহল বেগমের (১৯১৯-১৯৭৩), ‘কোরান মুকুল’ (১৯৪০), মীজানুর রহমানের (১৯০০-১৯৬০) ‘নূরের বলক’ ও ‘বেহেস্তী সওগাত’ (১৯৪৪-১৯৪৭), মুফতী মুহাম্মদ ওয়াফীর ‘তাফসীর পারা আম্ম’ (১৯৪৫), মাওলানা কুদরাত-ই-খুদার (১৯০০-১৯৭৭) ‘পবিত্র কোরআনের পুত কথা’ ১ম ও ২য় ভাগ (১৯৪৫-১৯৪৭) ও রংপুর নিবাসী মুনীর উদ্দিন আহমদেও ‘হাফীজীল কাদেরী’ (১৯৪৭) ইত্যাদি।

উল্লিখিত পবিত্র কুরআনের খন্ডিত অনুবাদগুলোর মধ্যে মাওলানা রুহুল আমিনের অনুবাদটি ছিল তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক যুগের কুরআনের অনুবাদকদের বিভ্রান্তিকর অনুবাদের খন্ডন স্বরূপ।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু’টি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ফলে বঙ্গদেশ তথা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম ভারতের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। আর আসামের সিলেট জেলাসহ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের পূর্বাংশে পরিণত হয়। অখন্ড ভারতের বাঙ্গালী মুসলিম

পাণ্ডিত ও কবি সাহিত্যিক দেও সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের তৎপরতা কলকাতায় কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের জন্য সাহিত্যকর্মের মূল কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা কলকাতার স্থলাভিষিক্ত হয়। এ দিকে পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষা আন্দোলনেরও তৎপরতা শুরু হয়। এ সময় স্বাধীনতাত্ত্বের উভয় দেশের উভয় বঙ্গে বাঙ্গালী মুসলিম পাণ্ডিত ও কবি সাহিত্যিকরাও নব উদ্দীপনায় সাহিত্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় কুরআনী সাহিত্যেও এর বেশ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সময় উভয় বঙ্গে বাঙ্গালী মুসলিম পাণ্ডিত ও কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই গদ্য ও পদ্যাকারে কুরআনের বঙ্গানুবাদ, কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধ রচনা করে কুরআনী সাহিত্য-চর্চাকে সমৃদ্ধ করতে মনোনিবেশ করেন। পাক-ভারতের স্বাধীনতাত্ত্বের ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে এ উপমহাদেশে কুরআনী সাহিত্য চর্চায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ও ভাষ্য লিখনে যাঁরা বিশেষভাবে অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে খাঁন বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ (১৮৯০-১৯৬৪), মাওলানা আবদুল মান্নান কতূক অনূদিত বিশ্বখ্যাত ইসলামীক স্কলার ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান (رحمة الله عليه) এর কালজয়ী তরজুমা 'কানজুল ঈমান' প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাময়িকপত্রে কুরআন চর্চা

পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, ও কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে কুরআন চর্চার ক্ষেত্রে বাংলা সাময়িক পত্রের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা সাময়িকপত্রে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ চর্চা লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য শতাব্দীর ৭০ এর দশক থেকে বাংলা সাময়িক পত্রে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ চর্চা আরম্ভ হয়। কলকাতার অধিবাসী ভারতীয় খৃস্টান তারাচরণ চট্টোপাধ্যায় জনৈক মাওলানার সহযোগিতায় ও মাওলানা আবদুল কাদেরের উর্দুভাষায় অনূদিত কুরআনের সাহায্যে প্রায় ১২ পারা পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ করেন। আর এই অনুবাদ চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গমিহির' পত্রিকায় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। এবং ১৮৮২

খৃস্টাব্দে অনুবাদটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৮৯১ খৃস্টাব্দ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৬) সম্পাদিত ‘ইসলাম প্রচারক’ পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

পরিসমাপ্তি

পৃথিবীতে মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে আল-কুরআন হাতেই লিখা হতো। কুরআনের হস্তলিপিকারগণ যে অনন্য সাধনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ইতিহাসে এর অন্য কোন নথির নেই। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর সর্বপ্রথম জার্মানির হামবুর্গ শহরে হিজরী ১১১৩ সনে আল-কুরআন মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত সেই আল-কুরআনের একটি কপি মিশরের দারুল কুতুবে এখনো সংরক্ষিত আছে। কিন্তু মুসলিম জাহানে সে সমস্ত মুদ্রিত কপি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। মুসলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে উসমান কতৃক রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আল-কুরআন মুদ্রিত হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইরানের তেহরানে লিথু মুদ্রণযন্ত্রে আল-কুরআনের আর একটি কপি মুদ্রিত হয়। এরপর সারা দুনিয়ায় মুদ্রিত কুরআন ছড়িয়ে পড়ে। আর এখন পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই, সব ভাষায়ই অনুদিত হয় আল কোরআন। তবে, পঠিত হয় আরবী ভাষাতেই। হযরতে সাহাবী, তাবয়ী, তাবে তাবয়ী, আউলিয়ায়ে কেরামদের জীবন আবর্তিত হয়েছে কোরআনকে ঘিরে। তারা কোরআন মুখস্থ করেছেন, কোরআনের জ্ঞানে নিজেরা জ্ঞানী হয়েছেন এবং অন্যকে কোরআনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে। আর দিনে পাঁচ বার কোরআনের মুখস্থ করা অংশ থেকে তেলাওয়াত করা তো নামাজ কায়েমের জন্যে বাধ্যতামূলক। আবার রাতে দীর্ঘসময় নামাজে দীর্ঘ সূরা পাঠ পরিণত হয় অনেকের দৈনন্দিন অভ্যাসে। সেই যুগে এমন কোনও শিক্ষিত পরিবার ছিল না, যেখানে অন্তত একজন হাফেজ ছিলেন না। কালের বিবর্তনে কোরআন মুখস্থ করা শিক্ষার একটি অংশে পরিণত হয়। হাজার হাজার হিফজখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোরআন নাজিলের ১৪ শত বছর পরও কোরআন মুখস্থকারীর সংখ্যা কোনোভাবেই হ্রাস পায়নি, বরং বেড়েছে। মুসলমানদের এমন কোনও পাড়া বা মহল্লা নেই, যেখানে

আরব-অনারব, কালো-সাদা, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ কেউ না কেউ কোরআন মুখস্থ পারেন না। এই হিফজ শিক্ষার শুরু রসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে। তার মাধ্যমে শিখেছেন সাহাবীরা। আর তাদের সত্যায়িত প্রক্রিয়াতেই এখনও প্রতি বছর হিফজ করছেন হাজার হাজার হাফেজ।

তথ্যসূত্র

<https://sundormon.wordpress.com/2020/08/03/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA/>

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ <https://www.academia.edu/111371799/>